কিটো ডায়েটের খুঁটিনাটি

ময়ূরাক্ষী সেন

বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষজন ফিটনেস সচেতন। কিন্তু ব্যস্ত জীবনে সঠিক পরিমাণে খাবার গ্রহণ করা এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ রাখা বেশ কঠিন। কারণ ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সঠিক খাবার গ্রহণের পাশাপাশি সময়মতো খাবার গ্রহণ করাও জরুরি। আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে কি না তা নির্ভর করছে খাবারের সময়ের উপরেও। অনেকে ওজন কমানোর পদ্ধতি হিসেবে শারীরিক পরিশ্রম কিংবা ব্যায়ামকে বেছে নেন। ব্যায়াম করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এটি ওজন কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু ব্যায়ামের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হলে কখনই ওজন কমবে না। ওজন কমানোর জন্য ৮০ ভাগ ভূমিকা খাবারের আর বাকি ২০ ভাগ ব্যায়ামের। ওজন কমাতে চাইলে কিংবা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে প্রথমে খাবারের দিকে সতর্ক নজর রাখা জরুরি। শরীর-স্বাস্থ্য কেমন থাকবে তার বেশির ভাগ নির্ভর করছে আপনার গ্রহণ করা খাবারের উপর।

জীবনে যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন নিজের খাবার সম্পর্কে সতর্ক থাকা এবং একটি স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করা জরুরি। ওজন নিয়ন্ত্রণে না থাকলে আপনার সৌন্দর্য যেমন নষ্ট হবে তেমন এর পাশাপাশি দেখা দিবে নানা ধরনের রোগ। হৃদরোগ, ডায়বেটিস থেকে শুরু করে নানা ধরনের দীর্ঘমেয়াদি রোগ শুধুমাত্র ওজন বৃদ্ধির কারণে হয়ে থাকে। এছাড়া নারীদের হরমোনের উপর একটি বিশেষ প্রভাব ফেলে অধিক ওজন। অতিরিক্ত ওজনের ফলে অনেকের মাসিক নিয়মিত হয় না। অনেক সময় অতিরিক্ত ওজনের ফলে সন্তান নেওয়ার চেষ্টা করার পরেও গর্ভধারণ করা সম্ভব হয় না। অতিরিক্ত ওজন শরীরে সরাসরি প্রভাব ফেলে, তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অনেকে অনেক ধরনের ডায়েট অনুসরণ করে। আপনার ডায়েট কেমন হবে তার নির্ভর করছে জীবনযাত্রা ও পেশার উপর। কারণ সবার জন্য এক ধরনের ডায়েট উপযোগী নয়। শরীরের চাহিদা বুঝে ডায়েট না করলে লাভের চেয়ে বড় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। ওজন কমানোর জন্য বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় ডায়েটের প্রচলন রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো কিটো ডায়েট। বেশ কয়েক বছর ধরে বিশ্বজুড়ে এই ডায়েট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। জেনে নেওয়া যাক কিটো ডায়েটের বিস্তারিত।

কিটো ডায়েটের ইতিহাস থেকে দেখা যায় ১৯১১ সালের মৃগী বা খিঁচুনি রোগের চিকিৎসার জন্য ভালো কোনো ওষুধ ছিল না। তখন চিকিৎসকরা কিটো ডায়েট দিয়ে এ রোগের চিকিৎসা করতেন। তখন রোগীদের না খাইয়ে রাখা হতো, এতে শরীরে কিটোন বডি তৈরি হতো। এতে এপিলেপসি বা মৃগি রোগ কমে যেত। ১৯৩৪ সালে প্রথম এপিলেপসির ওষুধ ফেনাবারবিটাল আবিষ্কারের পর থেকে এর জনপ্রিয়তা কমে যেতে থাকে। এরপর আবার ১৯৯৪ সালে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওষুধ দিয়েও এ রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছিল না। তখন আবার কিটো ডায়েটের আবির্ভাব হয়। খিঁচুনি রোগের চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহার করা হলেও পরে দেখা গেলো অনেক মানুষ ওজন কমানোর জন্য এই ডায়েট বেছে নিচ্ছে। শুধু যে ওজন কমানোর জন্য কিটো করা হয় তাই না কিটো ডায়েটের ফলে রক্তে চিনির পরিমাণ ঠিক থাকে বলে অনেক ডায়বেটিস রোগী কিটো ডায়েট বেছে নিচ্ছেন। আবার অনেকে কোনো কারণ ছাড়াই শরীর সুস্থ রাখতে কিটো ডায়েট করেন। এমন অনেক মানুষ আছেন যারা বছরের পর বছর কিটো ডায়েট অনুসরণ করছেন। তবে অনেকেই কিটোর ব্যাপারে সঠিক ধারণা না রেখে এ ডায়েট করেন। কিটোর যে শুধু উপকারিতা আছে তা নয়, না বুঝে ও সঠিক ভাবে কিটো না করার ফলে শরীরের ক্ষতিও হতে পারে। তাই কিটো ডায়েট নিয়ে সঠিক ধারণা রাখা উচিত।

কিটো ডায়েট মূলত কার্বোহাইড্রেটকে এড়িয়ে চলা হয়। কিটো ডায়েটের প্রধান উদ্দেশ্য রক্তে গ্লুকোজ কমানো। গ্লুকোজের জায়গায় কিটোন বডিগুলো শক্তি হিসেবে জমা রাখা। এই ডায়েটে সাধারণত ফ্যাট অনেক বেশি থাকবে আর প্রোটিন মাঝারি মাপের থাকবে। কিটোতে ফ্যাটের উপর সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়। কিটো ডায়েট শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ওজন কমে যায়। এটির কারণ গ্লাইকোজেন ভেঙে যে পানি বের হয় তার ওজন কমে যাওয়া। ধীরে ধীরে ওজন কমার পরিমাণ কমতে থাকে। কারণ এই পানি কমার পর শরীরের ফ্যাট কমা শুরু করে। আর শরীরের ফ্যাট গলতে সময় লাগে। গ্লাইকোজন ও হাড়ের ওজন কমে যাওয়ার কারণে কিটো ডায়েটের শুরুতে দ্রুত ওজন কমে। গতানুগতিক কিটো ডায়েটে ক্যালোরির পুরো চাহিদার মধ্যে কার্ব থাকবে ৫%, প্রোটিন ২৫% আর ফ্যাট ৭০%। আর সাধারণ ডায়েটে ৫০% কাবোহাইড্রেট, ২০% প্রোটিন আর ৩০% ফ্যাট থাকে।

তবে কিটো ডায়েট নিয়ে রয়েছে অনেক বিতর্ক। অনেক পুষ্টিবিদ পরামর্শ দিয়ে থাকেন ওজন কমানোর জন্য কিটো ডায়েট করা প্রয়োজন নেই। রুটিন মাফিক খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করেই ওজন কমানো সম্ভব। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে অতিরিক্ত কিটো ডায়েট করার ফলে কিডনিতে পাথর হতে পারে। আবার কিটো করার ফলে শরীরে ইলেক্ট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হতে পারে। অনেক ডায়বেটিস রোগী ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে শুধু কিটো ডায়েট করেন যা অনেক বিপদজনক।

কিটো ডায়েটের উপকারিতা হিসেবে ধরা হয় এটি দ্রুত ওজন কমাতে সাহায্য করে। শর্করার পরিমাণ কমিয়ে এনে শরীরে জমে থাকা বাড়তি ফ্যাট কমানো হয়। শরীর যখন বাইরে থেকে শর্করা পায় না তখন শরীরকে শক্তি দেওয়ার জন্য জমে থাকা ফ্যাট ব্যবহার করে তখন ওজন কমতে থাকে। কিটো ৪ প্রকার:

১. স্ট্যান্ডার্ড কিটোজনিক ডায়েট: এই ডায়েটে কার্ব ৫%, প্রোটিন ২৫% আর ফ্যাট ৭০% থাকে।

২. সাইক্লিক্যাল কিটোজনিক ডায়েট: এই কিটোতে সপ্তাহে দুদিন হাই কার্ব খাওয়া যায়।

৩. টার্গেটেড কিটোজনিক ডায়েট: এই কিটোতে ওয়ার্ক আউটের আগে বা পরে কার্ব খেতে পাওয়া যায়।

৪. হাই প্রোটিন কিটো ডায়েট: এটা অনেকটা স্ট্যান্ডার্ড কিটো ডায়েটের মতোই, শুধু প্রোটিন ২৫% থেকে বেড়ে ৩৫% হয়ে যায়। এটাতে ফ্যাট ৬০%, প্রোটিন ৩৫% আর কার্ব ৫% থাকে। বডি বিল্ডার বা অ্যাথলেটরা এটা করে থাকেন।

যে ধরনের খাবার গ্রহণ করা যায়

সব ধরনের মাছ, মুরগির মাংস, গরুর মাংস, ডিম, বাটার, ঘি, বাদাম, অলিভ অয়েল, নারকেল তেল, ব্রকলি, বাধাকপি, ফুলকপি, পালং শাক, লাল সবুজ সবজি, যেকোনো ধরনের মসলা, অ্যাভোকাডো ইত্যাদি।

যে ধরনের খাবার গ্রহণ করা যাবে না

সব ধরনের মিষ্টি, ডাল, পাস্তা, নুডুলস, ওটস, রুটি, ভাত, যেকোনো ধরনের ফাস্টফুড, মিষ্টি ফলের রস, বাইরের তেল মসলা দেওয়া খাবার, প্যাকেট জাতীয় খাবার যেমন চিপস, চানাচুর, কোক, চকলেট, যেকোনো প্রিজারভেটিভ দেওয়া খাবার ইত্যাদি।

কিটো ডায়েটে খাবারের সঠিক নিয়ম মেনে চলা অনেক জরুরি। তা না হলে কিটো ডায়েটের উপকারিতা পাওয়া সম্ভব নয়। তবে এই ডায়েট করার ফলে শরীরে যা যা ক্ষতি হতে পারে তা জেনে রাখাও জরুরি। অনেকদিন কিটো করার ফলে শরীরে ফাইবারের পরিমাণ কমে যায়, সব ধরনের ভিটামিন পায় না, নিম্ন রক্তচাপ হতে পারে, ব্লাড সুগার অতিরিক্ত কমে যেতে পারে, কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। অনেকের কিটো করার ফলে ঘুম কমে যায় ও মেজাজ খিটখিটে থাকে। এছাড়া অনেকের সারাদিন ক্লান্ত লাগে।

কিটো ডায়েট নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। ডায়েটের ফলে কিডনি রোগসহ নানা ধরনের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ ধরনের কঠোর ডায়েট করার আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে করতে হবে। কখনই আশেপাশের মানুষের পরামর্শ শুনে ডায়েট করা উচিত নয়।

কিটো ফুড লিস্ট

যা খাওয়া যাবে	যা খাওয়া যাবে না